[প্রবন্ধ]

হিমবেহালা কিংবা পিয়াস মজিদের কবিতা

নিয়াজ মাহমুদ

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99579-8-0

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

হিমবেহালা কিংবা পিয়াস মজিদের কবিতা
নিয়াজ মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : নাওয়াজ মারজান
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

Himbehala Kingba Pias Majider Kabita
by Niaz Mahmud
First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

হারুন-অর-রশিদ (১৯২২-২০১৫)
আমার পিতামহ, কবিদের প্রতি যার ছিল অগাধ মুগ্ধতা

সূচি

শুরুর কৈফিয়ত ০৮

প্রথম তিন দরোজা

নৃত্য ও মৃত্যুর নন্দন ১৩
মগ্নতার ঋতুতে জন্ম নেওয়া স্বপ্ন অথবা বাস্তব ২২
সহস্র আলোর ঝরোকায় গোধূলিকরোজ্জ্বল ৩৭

মধ্যবর্তী জানালা

নিঝুম মল্লার এবং পিয়াসের কবিতার ব্যাকরণ ৪৯
যে রেস্তোরাঁয় পরিবেশিত হয় ক্ষুধা ৫৭
বেঁচে থাকাই মৃত্যুর প্রগাঢ় স্বীকৃতি ৬৮

দীর্ঘ কিছু বন্দরে

এক দিন এক রাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা ৮৩
ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ৯১
বিস্রস্ত-বেলার বিষণ্ন বয়ান ৯৭

বাঁকবদলের প্রান্তে

বিস্মৃত স্কার্টে বিধৃত জীবন ১০৩

শেষ কথা কিংবা অশেষ ১১৬

শুরুর কৈফিয়ত

এই তো ভাল লেগেছিল...

সব শিল্পমাধ্যমের শিল্পীই সৃষ্টি করেন যার যার একান্ত জগৎ। স্বর, বর্ণ, শব্দ, কথার নানা রকম বিন্যাসভঙ্গি মেনে সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, কবি, লেখক নির্মাণ করেন নিজ সৃষ্টি-বিশ্ব। শিল্পকে যেহেতু অপরের উপভোগের জন্য রচনা করা হয়, তাই শিল্পকে নিয়ে কথা বলতে হয়। এই কথা বলাটা চালু রাখার উদ্দেশ্যেই বইটিতে জায়গা পাওয়া লেখাগুলো ২০১৭ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে।

বাংলা কবিতা সেই চর্যাপদের বৌদ্ধ দোঁহা গান বা তারও আগে জন্মলাভ করে বিকাশের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে আজকের এই অবস্থানে এসেছে। এ ভাষায় বিশ্বের কালজয়ী সার্থক মহাকাব্য লেখা হতে পারেনি ঠিকই, তবে বাংলা কবিতার সৌধ সংস্কৃতজাত অপরাপর ভারতীয় ভাষার কবিতা থেকে আরো সূক্ষ্মতা ও জটিলতার ধাপে পৌঁছতে পেরেছে। প্রাচীন সময়ের পারস্য, চীনা, ল্যাটিন, গ্রিক, সংস্কৃত কিংবা আজকের ইংরেজি ফরাসি ইত্যাদি ভাষার কাব্যধারা বিশ্লেষণ করে এমন সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, যেসব ভাষায় বিভিন্ন রকম বিজ্ঞানচর্চার হাত ধরে ভাষাভাষীদের 'চিন্তা' বিকশিত হয়নি, সে ভাষার কবিতাও থেকে গেছে অবিকশিত। প্রাচীন কাব্যসাহিত্য বিশ্লেষণ করলেও আমরা দেখি যে পুরাকালে তারাই ভালো কবিতা লিখেছেন, যাদের গণিতশাস্ত্র অন্য সব জাতির চেয়ে উন্নত ছিল।

হাল-সময়ের বাংলা কবিতা পড়ার ক্রেজ হলো, পুরো কবিতার নয়; বরং এক দুই লাইনের প্রবচন (aphorism) পাঠকের কাছে

বেশি প্রিয় হচ্ছে। এটি আমাদের আচরণের স্বাভাবিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র নয়; বরং তার থেকে নেওয়া আধ মিনিটের ভিডিও রিলই বেশি দেখা হয়। কবিতার ক্ষেত্রেও ইদানীং তেমন প্রবণতাই দেখা যায়। নজর এড়ায় না যে বর্তমানে কবিতার বই খুব বেশি লোক কিনে পড়েন না। কাজেই সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় ভেসে ওঠা একটি দুটি কবিতার পঙ্‌ক্তি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, সেগুলো মূলত অ্যাফরিজম বা প্রবচন ধরনের বাক্য।

কবি পিয়াস মজিদের কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে চোখের সামনে দৃশ্যমান-ঘটমান বিশ্ব এবং তার পঠন-বিশ্বের নানা উপচার। এ কারণে তিনি মির্জা গালিব অথবা লোরকাকে নিয়ে কবিতা লিখে থাকলেও বাংলার গ্রামীণ জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ তার কবিতায় অনুপস্থিত।

এ কালের বেশিরভাগ কবির মতো পিয়াসের কবিতারও দুটো আলাদা চেহারা আছে। একটা তার কবিতার বইগুলোতে প্রতিভাত চেহারা, অপরটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত আদল। এই দুই মুখচ্ছবি সদৃশ নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়া টুকরো টুকরো খণ্ডকথায় বইয়ের কবি পিয়াস মজিদকে তেমন করে পাওয়া যাবে না। তার উত্তীর্ণ কবিতাগুলোর অনেকটিই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয় না, কারণ সেসব কবিতা মুষ্টিমেয় সমঝদারের যতটা ভালো লাগবে, প্রেম-ঢলোঢলো স্ট্যাটাস খুঁজে ফেরা যুবা-অনুসারীকে ততটাই করবে বিরক্ত। এ কারণে, সোশ্যাল মিডিয়ার ছিন্ন টাইমলাইনে নয়, কবির খোঁজ পেতে চাইলে পাঠককে ফিরতে হবে তার প্রকাশিত বইয়ের সমগ্রতায়।

আমাদের সাহিত্যে কবিদের জীবদ্দশায় তাদের সচেতন ও পদ্ধতিগত (Systematic) পঠনের প্রথা গড়ে ওঠেনি। ফলে অপরের সাড়ার অভাবে কবিতা লিখবার অনুপ্রেরণা কবি তার সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়ে পান না। আজকের কবির কাছে কবিতা লেখাটা তাই সুদূর ভবিষ্যতের বিনিয়োগের মতো, কবি পিয়াস

মজিদের ভাষায়, 'যাতে জঘন্য জীবন শেষে/ যেন মৃত্যুর পর তার কবরটা/ একটু আলাদা দেখায়'।

যাবতীয় বিপত্তি-সম্ভাবনা সত্ত্বেও, কবিকে পৌঁছতে হবে পাঠকের কাছে। কবির আর পাঠকের মধ্যে সংযোগসেতু স্থাপনে কবিতার বইয়ের আলোচনার ভূমিকা আছে। তবে সে জন্য সাহিত্য আলোচনাকে সৎ হতে হবে। সাহিত্য সমালোচনা যদি একে-অপরকে পিঠ চাপড়ে দেওয়ার সংঘ হয়ে ওঠে, তাহলে তা পাঠককে প্রতারিত করার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতিই করবে।

কবি পিয়াস মজিদ জীবনের চল্লিশটি বসন্ত পার করেছেন। জীববিজ্ঞানের হিসেবে তারুণ্যের শেষভাগে অবস্থান করছেন তিনি। যদিও বুদ্ধিবৃত্তিক হিসাব ভিন্ন। অনেকের ক্ষেত্রে লেখা শুরু করারই বয়স এটি। তার কবিজীবনের বয়সও দেড় থেকে দুই দশকের মধ্যে। প্রথম দিক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রকাশিত কবির কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্য থেকে দশটির ওপর আলোচনা থাকছে এই বইয়ে। একদম প্রথম প্রকাশিত তিনটি কবিতার বইয়ের আলোচনা লিখেছি সবার শেষে, সেগুলো প্রকাশের প্রায় এক যুগ পরে। বাকিগুলো বই প্রকাশের কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই লেখা। সাতটি লেখা বিভিন্ন সময়ে কাগজে আর অনলাইন বিভিন্ন পত্রিকায় (*কালি ও কলম, নান্দীপাঠ, পাতাদের সংসার, এবং বই, শ্রী.কম* ইত্যাদি) প্রকাশিত হয়েছে।

বই থেকে বইয়ের এই কালানুক্রমিক পরিক্রমায় পাঠক হিসেবে কবির আবির্ভাব, নবীনত্ব, বিকাশ, পরিণতি যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছি তা প্রকাশের চেষ্টা করেছি। তার কবিতাকে প্রথম দিককার কবিতার ভাষা থেকে সাম্প্রতিক সময়ের ভাষায় বিবর্তিত হতে দেখার অভিজ্ঞতাও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে।

বইটিকে ধরে নিতে হবে একজন আম-পাঠকের পাঠ প্রতিক্রিয়া। কবিতার বড় সমঝদার, কবিতা-আন্দোলন কিংবা কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা কারোর লেখা এটি নয়। ভবিষ্যতে যদি কবি পিয়াস

মজিদের কবিতা সাহিত্য-বিদ্বৎদের আলোচনার টেবিলে ওঠে এবং তখন যদি বইটিতে লেখকের রাখা সব প্রস্তাব ভ্রান্ত ও অসত্য প্রমাণিতও হয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

জীবনানন্দ দাশ যেমন 'মা' এবং 'বর্ষাকাল' নিয়ে প্রায় কোনো কবিতাই লেখেননি, কারণ হতে পারে রবীন্দ্রনাথ এ দুই বিষয়ে কালোত্তীর্ণ এমন বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ ও তার ঘরানার কবিতা থেকে উত্তরণের প্রয়াস হিসেবে জীবনানন্দকে এ দুই বিষয় বাদ দিয়েই লিখতে হয়েছে—অনুরূপভাবে পিয়াসের উত্তর-উত্তরাধুনিক মননের সচেতন বাছাইয়ে তার কবিতার বিষয়বস্তু হওয়া থেকে বাদ পড়েছে জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, ঈশ্বরচিন্তা, ধর্মভক্তি, রাজতোষণ, রাষ্ট্রচিন্তা, রাজনৈতিক অবস্থান, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-চিত্রনির্মাতা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তির বন্দনা। অর্থাৎ কবি পিয়াস মজিদ এই বিষয়গুলো কখনোই তার কবিতায় আনেননি। সামাজিকভাবে সফল কবি হয়ে পদ-পদবি উপার্জনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো নিয়ে কবিতা লেখা যে লাভজনক—তা কারোর অজানা নয়। কিন্তু এসবের বাইরে কেবল শিল্পী হয়ে থাকার প্রেষণায় কবি হয়ে থাকলে কবিকে সামাজিক সফলতার আগ্রাসি চোরাবালি এড়িয়ে চলতে হয়।

পাঠক বেশে কবি পিয়াস মজিদের এই প্রব্রজ্যার দর্শক তথা সাক্ষী হতে পারা আমার জন্য আনন্দের ছিল। আমার পাঠে কবিকে আবিষ্কারের এক ইতিবৃত্ত বলা যেতে পারে লেখাটিকে। সেই সাথে, সামনের দিনগুলোতে পিয়াস মজিদ পাঠকদের আরো আরো নিজস্বতাময় কবিতা উপহার দিয়ে চলুন, সেই কামনা করি।

নিয়াজ মাহমুদ
৩ জানুয়ারি ২০২৫

প্রথম তিন দরোজা

নৃত্য ও মৃত্যুর নন্দন

সাধারণ নির্বচন

কিছু কবিতার বই স্থাপত্যের মতো না হয়ে, হয়ে থাকে এক ভ্রমণের মতো। সেসব বইয়ে কবি যতটা না স্থপতি হন, তার চেয়ে বেশি হন একজন ভ্রমণ-গাইড। এমনটি হওয়ার কারণ—সে বইয়ের কবিতার বিষয়বস্তু পাঠকের চেনা জগতে আগে থেকেই ছিল। ভ্রমণ-গাইডের মুনশিয়ানায় কবি সেসব প্রত্ন বা প্রাকৃতিক নিদর্শনকে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করেন একেকটি চমকের মতো। একটা সুন্দর প্রাসাদে বেড়াতে ঢুকে স্বাভাবিকভাবে আমাদের তার স্থপতিকে মনে না পড়লেও পর্যটক হিসেবে ট্যুর গাইডকে আমরা যথাসম্ভব মনে রাখি আমাদের সুন্দর ভ্রমণের সাথি হিসেবে। কবি পিয়াস মজিদের প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই *নাচপ্রতিমার লাশ* বইটি আমাকে তেমন একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিয়েছিল ঠিক দশ বছর আগে, যখন ২০১৪ সালে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হলো। বইটি প্রথমবার প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে।

পুরো বইয়ে শিরোনাম পাওয়া যায় মাত্র দুটি। প্রথমটি *হিমবেহালা* শিরোনামে একটি কবিতাগুচ্ছ, যাতে রয়েছে টানা গদ্যে লেখা ৩৭টি সংক্ষিপ্ত কবিতা। অপরটি *নাচপ্রতিমার লাশ* শিরোনামের একটি কবিতা, যেটি দুই-তিন ছত্রের ছোট ছোট বেশ কয়েকটি স্তবকে লেখা।

বইটির প্রথম প্রকাশের সময়ে কবি পঁচিশ বছর বয়সি তরুণ। বইয়ে গ্রন্থিত কবিতাগুলো বোধ করি আরো আগে লেখা। প্রথম বই

হলেও এর ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্য ও নতুনত্ব পাঠককে বুঝিয়ে দেয় যে কবি বয়সে নবীন হলেও কবিতা লিখতে বসায় তার প্রস্তুতির কমতি নেই। প্রথম বয়সে হাত মকশো করার জন্য লেখা দুর্বল কবিতাগুলোকে প্রকাশ না করে কবির সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। তাই হয়তো বাংলা কবিতায় নিজস্ব স্টাইল তৈরি করা সহজ নয়। এমনকি জীবনানন্দ দাশও তার প্রথম বই *ঝরা পালক*-এ হয়ে পড়েন সমবয়স্ক কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো। নিজের স্টাইল খুঁজে পান দ্বিতীয় বই *ধূসর পাণ্ডুলিপি*তে। তা থেকে শিক্ষা নিয়েই কি না জানি না, কবি পিয়াস মজিদকে তার প্রথম প্রকাশিত বইটি জুড়েই লক্ষ করি কবিতার স্বতন্ত্র বাক্‌ভঙ্গি তথা স্টাইল তৈরি করতে এবং তৈরি হওয়া সেই স্টাইলের প্রতি অনুগত থাকতে। বিষয়বস্তুভিত্তিক একটি কবিতাও না লিখে, কেবলমাত্র আবিষ্কৃত বাক্‌ভঙ্গির ওপর দাঁড়িয়ে, কবিতার সব ভাবনাকে সেই বাক্‌ভঙ্গির ছাঁচে ফেলে বইটির কবিতাগুলো লেখা। প্রথম বইয়ে এতখানি করবার দুঃসাহস তরুণ কবিদের মাঝে বিরল। সাহিত্যের যাত্রাপথে শিল্পীর নিজেকে আবিষ্কার করতে পারা পরশ-পাথর খুঁজে পাবার মতো সৌভাগ্যের বিষয়।

‘হিমবেহালা’র ভেলায় ভ্রমণ

হিমবেহালার কবিতাসফরে পাঠক প্রবেশ করেন, এ সফরে পাঠকের ভ্রমণ গাইডের ভূমিকায় থাকেন তরুণ কবি পিয়াস মজিদ। পাঠকের ভ্রমণটি শুরু হয় ‘ছোট নদী পাহাড় বাগিচা রক্তের নির্ঝরে’। শ্যাওলার গন্ডোলায় ভেসে ভেসে কবি পাঠককে দেখান মৃত্যু ও সুন্দরের যুগলবন্দি, জীবনের জটিল সারগাম। ধাতব ফুলের তোড়া দিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা জানান বেঁচে থাকার এই রিক্যুয়াম, সোনাটায়। ভ্রমণে আরেকটু এগোলে পাঠক শোনেন এক লবণহীন সমুদ্রের আখ্যান—হীরার কুচি,

সোনার কুচি ভরা প্রান্তরের গান। মৃত নর্তকীর শ্বাস, সঙ্গে তার ক্লান্ত নুপূরের বিষণ্ন রুমঝুম ভেসে আসে কানে।

ভ্রমণে অগ্রসর হতে থাকলে পাঠক-পর্যটকের সামনে পড়বে মাছপরিদের দ্বীপ; দগ্ধ সারস, হিমঝোপ পেরিয়ে তিনি হাজির হবেন নীল ঘাসের বনে। সেখানে ঝরে সিক্তবৃষ্টি, হাত-পা ছড়াতে দেখা মিলবে শরতের স্মৃতিদাগ, দূরে ভেঙেচুরে পড়ে সমুদ্রের ফেনিল স্থাপত্য।

পাঠক দেখবেন রূপকথার পরিরা পিরিচে ঢেলে দিচ্ছে হিংস্র আলোর দ্যুতি। আমাদের কবি মারবেল ফলের মৌসুম শেষে শুষ্ক বাগিচা ঘুরে কুড়িয়েছেন সান্ধ্য কুয়াশা, মৃত্যুসংকেত ও ব্যথার নীলাভ ঘূর্ণি। আড়াল থেকে এই ধ্বংসদৃশ্যে সায় দিয়ে গেছে সুবর্ণসিংহ ও হীরা-হরিণের দল।

হিমবেহালার আরম্ভ থেকেই কবি তার নিজস্ব ভাব-ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন এবং শব্দে শব্দে কবিতাগুলো যতই এগিয়ে গেছে, কবি তার ছন্দ হারাননি। কবিতাগুলি এক তরুণ কবির প্রথম দিককার লেখা—এই বাস্তবতা বিবেচনায় না নিলেও বলা যায় যে অনেকটা প্রস্তুতি, অনেকটা নিষ্ঠা, অনেক পরিশ্রম ছাড়া এমন কবিতা লেখা যায় না; ঠিক যেমন সাধনা না থাকলে সহজ কথায় জীবনানন্দও লিখতে পারতেন না—

> *আমাকে খোঁজ না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে*
> *খুঁজি না কো, একই নক্ষত্রের নিচে তবু এক আলো পৃথিবীর 'পরে*
> *আমরা দুজন আছি—*

কিংবা বিনয় মজুমদারের পক্ষেও লেখা সম্ভব হতো না—

> *তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে*
> *চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।*

বইটিতে কবি সুখপাঠ্য ভাষাকে আশ্রয় করে কবিতা লেখেননি। সুখপাঠ্যতার পথ মাড়িয়েই যে কবিতা নির্মাণ করতে হবে—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং এক তরুণ কবি তার যাত্রার শুরুর দিকে যে ভাষার পারদর্শিতাকে অভীষ্ট বলে গ্রহণ করবেন, এমনটাই প্রত্যাশিত।

নাচপ্রতিমার লাশ-এও তেমনটিই দেখলেন পাঠক।

আবার ফিরে যাই *হিমবেহালা* ভ্রমণে, যেখানে শুরু হলো 'চন্দ্রমন্থনের রাতে খয়েরি খেলায় নীল নিমজ্জন।' 'বুদ্ধগয়ার পথে হিংসাসূর্যের বিভা।' 'নরকের ফুল আছে গাছে' (স্মর্তব্য : শার্ল বোদলেয়ার এর *নরকের ফুল* কাব্যগ্রন্থ)। পাঠকের তখন চোখে পড়ে শ্রীময় বসুধার ওপর গ্রহণলাগা তপনের ভার, যেখানে মৃত্যুর অমল রাগে অজস্র তারা ও সূর্য জ্বলে-নেভে।

কবিতাগুলো পড়তে পড়তে বইটিকে একটি সফরের মতো মনে হয়, কারণ এর কবিতায় কবিতায় শব্দের পর শব্দ গেঁথে তৈরি করা দৃশ্যকল্পের ক্রমিক স্ন্যাপশট। যেমন : 'জলের আঁধারে রাজহাঁসরূপে আলোর নেমে যাওয়া', 'পারুলবনে থোকা থোকা রোদনের ফুল ফুটে থাকা', 'সুরের শত্রু যে মেয়ে তারও হাতে বেলোয়ারি চুড়ি' ইত্যাদি ক্রমিক ভিডিও রিলের ভিড়ে পাঠককে নামিয়ে দেন কবি। তার কবিতায় আরোগ্য চেয়ে মৃত্যুসদনেই সবাই ভিড় করে। 'শুরু ও শেষের ঝনৎকারে জনম থেকে জনমের যে মৃত্যুরোল আছড়ে পড়ে', সেই মহাজাগতিক নাটকের মঞ্চায়ন আমরা দেখি। আহত গানের ব্যথায় সে আর জোড়া লাগে না—পথপ্রান্তে ছিন্নভিন্ন সুর হয়ে পড়ে থাকে। আবার, বইয়ের কোথাও প্রেমের কবিতা না থাকলেও নামের আদ্যক্ষরে ব্যঞ্জনবর্ণ, এমন দুই মেয়ে কবিকে তছনছ করে, ভাসিয়ে দেয় সোনায়-হীরায়, অতিলৌকিক এই দুই মেয়ে একই সাথে কবিকে মারে এবং বাঁচায়। তাদের কল্যাণে কবি আজ সুস্থ, তবু তার চায়ের পেয়ালায় রক্ত, আবার ভাতের থালায় ফোটে ফুল। কুসুমে শোণিতে, ঘৃণা কিংবা প্রেমসূত্রে গাঁথা তার দীপিত অভিজ্ঞান ও অন্ধকার। সেই মানসপ্রেমিকার গুপ্তপথে কবি এবং পাঠককে দাঁড়াতে হয় সমস্ত সুবাস খুইয়ে।

এরপর ভ্রামক পাঠকের সামনে অনেক দূরের হিম-গুহার শীতল গায়ে জ্বলে ওঠে লাল-নীল-সোনালি অজস্র আগুন। দশদিক থেকে প্রত্নচোরেরা জড়ো হয় তাদের গূঢ় অভিসন্ধি সমেত। কবির ভাষায় বললে, 'আমরা ছুটতে থাকি সেই প্যারানয়েড মেয়ের পিছে এবং বিকেল

পাঁচটার হাওয়াও এসে সায় দেয় আমাদের। তারপর কবরখানার মৃতেরা, পানশালার মাতালেরা মিলেঝিলে রাতারাতি এক উৎকল্পনার মাঠ।' নরকের কাসিদা গাইতে গাইতে কবি সাজিয়ে ফেলেন নিজের কফিন। দূরে দু'ফালি করে কাটা সমুদ্রে তার প্রেমিকার জন্য বিভক্ত জলভাষা।

কবিতায় কর্মধারয় এবং তৎপুরুষ সমাসের মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা হয়ে দাঁড়ায় কবির সিগনেচার স্টাইল। আমরা শুনতে পাই কিছু অশ্রুতপূর্ব শব্দ যেমন 'তমসাকুসুম', 'মৃত্যুমৃণাল', 'লিবিডোকঙ্কাল', 'গোলাপজোয়াল', 'তারাব্যাধ', 'বিষডুমুর', 'মৃত্যুকুসুমটিলা', 'চন্দ্রমন্থন' ইত্যাদি। শব্দ নিয়ে কবির নিরীক্ষাগুলো সবখানেই যে সফল হয়েছে, তা বলব না, তবু বাংলা কবিতায় এ এক নতুন ধারা।

দৃশ্যকল্প এ বইয়ের কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, তবে সবখানেই যে সেসব দৃশ্য নান্দনিক, তা নয়। যেমন : 'সাপেরা ছুটছে অরণ্যের সেই অংশে, ফুল যেদিকে ফণা বাড়িয়ে আছে'। কবির হাত ধরে পাঠকের ভ্রমণ এগিয়ে চলে। 'এক লোমশ তারার হিংস্র বিভায়' কবিকে 'অনুগত ভৃত্যের মত' করতে দেখা যায় 'মৃত্যু ও মেঘের কারুকাজ'। বস্তুত, আসন্ন মৃত্যুর জন্য জীবিত মানুষের দুঃখবোধই সকল শিল্পকলার জননী। কোথাও দুঃখের ভারে ধসে পড়ে পাহাড়, আমাদের পর্যটক দল হোটেলকক্ষে বসে শোনে অন্ধকার সমুদ্রের গর্জন। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নক্ষত্রের সাথে পাঠকের জানা হয় 'পিরানহা, প্রেমিকা ও মাতা মেরির ঠিকানা'। আর আমরা রহস্যের রেশমি গিঁট খুলতে গন্ধবণিকের মহল্লা ছেড়ে বারবার ঢুকে পড়ি বাদাম বাগানে। কাছে কোন বনে রহস্য-সবুজে লেপটে গেছে নিষ্ঠুর এপ্রিল।

'হিমবেহালা' আরো আরো দৃশ্যকল্পের মধ্যে পাঠককে বেড়াতে নিয়ে যায়, যেখানে মেয়েদের পায়ে পায়ে সোনা-হীরার শৃঙ্খল, যুবরাজকে ঘিরে নৃত্যপর ধানফুল, মধুমাছি, রুপালি রাক্ষস। যেখানে রক্তাভ সমুদ্রে ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে মেলে শত শত লিবিডো-কঙ্কাল। তীব্রগন্ধা কুরচি ফুল হাতে পাহাড় ডিঙিয়ে যাচ্ছিল কয়েকজন, যাদের আয়ু আটকে আছে চামেলির শুকনো পাপড়িতে।

কিছু কিছু স্থানে কবিতায় যেসব রূপক ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো গুপ্ত রহস্যের কুহক তৈরি করে পাঠকের মনে। উদাহরণ : 'হাজারদুয়ারি মহল ছেড়ে চন্দ্রগ্রস্ত নর্তকীর দল ঢুকে পড়ল সাপের সভায়'; 'অকূলে যমুনায় লাল পালের পাঁচটি তরণি মরে যায়'; 'প্রতি ডিসেম্বরে তাই আমার হত্যাকারীর শুভ জন্মদিন'; 'পৃথিবীর শেষ নর্তকীর ভ্রষ্টতম মুদ্রায় গেঁথে ওঠে কারো রক্তসবুজ শ্বাস' ইত্যাদি।

ভ্রমণের অন্তিমপর্বে কবি পাঠককে নিয়ে চলে যান 'বাদামি পাতার পাহাড়ে, যার চূড়ায় সোনালি মারবেলের স্যানাটোরিয়াম'। কবিকে পান করে সূর্যকুচি, দ্রাক্ষারস, হেজেমজে লুপ্ত সবুজ জলের লেক। স্যানাটোরিয়াম কবির কাছে আসবে, কারণ বিষাদের পৃথিবীতে অজস্র হর্ষসিন্ধু কিন্তু তার জল শুষে নিয়েছে ব্যথাবীণা।

'হিমবেহালা'র একদম শেষের দিকে কবির উচ্চারণ :

> *আমিই আনন্দম, ক্রুশের মিনার। ...তোমাতে প্রেম ঢালি। তুমি আজ হাড়ে গলা মোম। আবার তুমি মা মেরিতে ছেয়ে গেছ; জেরুসালেমে, খড়ের গাদায়। ...এই পথ কাঁটাশোভা, এই পথ যীশু। ...তুমি তবে নবরূপে রোপিত বিষাদ।*

শেষ হয় কবির দেখানো পথে পাঠকের মিঠেকড়া ভ্রমণ।

নৃত্য ও মৃত্যুর নন্দনতত্ত্ব

বইয়ের দ্বিতীয় এই কবিতাটির নামেই বইয়ের নাম। এই কবিতায় কবি আঁকেন নৃত্য ও মৃত্যুর যুগপৎ নন্দনতত্ত্ব। বিশ্বজগতে সদা চলমান যে সৃষ্টি আর ধ্বংসের নৃত্যলীলা, তারই দর্শক হিসেবে কবি লেখেন নামকবিতাটি। দুই/তিন কী চার লাইনের মোট পঁচিশটি হ্রস্ব স্তবকে সাজানো আছে কবিতাটি। প্রতিটি স্তবকে উল্লেখ রয়েছে নৃত্যের কোনো না কোনো

অনুষঙ্গের। যেমন: 'নাচ/ তুমি তার ঝলমল তরঙ্গ/ আমি রক্তপ্রভ মুদ্রা শুধু'।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে কাহলিল জিবরানের একটি লেখা :

> *একজন দার্শনিকের আত্মা বাস করে তার মস্তিষ্কে, কবির আত্মা কবির হৃদয়ে, গায়কের আত্মা তার কণ্ঠযন্ত্রে, কিন্তু একজন নর্তকীর আত্মা বসবাস করে তার সমস্ত দেহজুড়ে।*

বিশ্বলোকের মহানৃত্যকে এক নর্তকীর রূপকে কবি পাঠকের সামনে হাজির করেছেন *নাচপ্রতিমার লাশ*-এ।

এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে সম্পূর্ণ বইটিতে স্থান পাওয়া কবিতাগুলোকে ধ্রুপদি করে তুলতে কবির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এজন্য কোনো কবিতায় পাওয়া যায় না সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত কোনো শব্দ। কোনো কবিতায় কোনো ব্যক্তির নামোল্লেখ পারতপক্ষে এড়িয়ে গেছেন কবি। শুধু দুয়েক স্থানে মাতা মেরি, যিশু, সিদ্ধার্থ, কচ, দেবযানী প্রমুখ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম এসেছে।

বইটির কোনো কবিতায় নির্দিষ্ট ভূগোলের কোনো উল্লেখ নেই। কেবল তিনটি স্থানের উল্লেখ একবার করে পাওয়া যায়—বুদ্ধগয়া, জেরুসালেম এবং তিব্বত। সারা বইয়ে প্রেমকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা একটিও নেই। যাপিত জীবন, সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি এসবের অবতারণা নেই। কবিতাগুলো পড়ে পাঠকের বুঝবার উপায় থাকে না স্থান-কালের ভূগোল বা ইতিহাস।

নাচপ্রতিমার লাশ-এর কবিতাগুলোকে সম্ভবপর কবি সচেতনভাবেই স্থান-কাল-পাত্রের সীমারেখায় আবদ্ধ রাখতে চাননি। কবিতাগুলোকে চিরায়ত এবং ধ্রুপদি করে তুলবার প্রয়াস কবিতায় স্পষ্ট। কবির পরবর্তী বইগুলোতে বিভিন্নভাবে সমাজ-রাজনীতি-প্রেম-যাপিত জীবন এসব এসেছে। *নাচপ্রতিমার লাশ*-এর কবিতাগুলোকে কবি বাঁধাই করতে চেয়েছেন মহাকালের ফ্রেমে। কবি জীবনানন্দ দাশকেও আমরা দেখেছি *ঝরা পালক*-এর কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন কবিতাগুলিকে ধ্রুপদি করে তুলবার অভিলাষে। অর্থাৎ একজন নবীন কবির পক্ষে বিষয়টি

বিরল নয়। তবু *ঝরা পালক* ক্ল্যাসিক হয়ে ওঠেনি, কারণ তাতে যতটুকু জীবনানন্দ ছিলেন, তার চেয়ে বেশি মাত্রায় থেকে গেছে কাজী নজরুলের প্রভাব। পিয়াস মজিদ এ ব্যাপারে শুরুতেই সাবধানী। প্রথম বই থেকেই তিনি অন্যের প্রভাবমুক্ত, স্বকীয়।

বিনয় মজুমদারের কেবল প্রথম কবিতার বই নয়, তার যতগুলো বই পাঠক নিয়েছে, তাদের প্রায় কোন কবিতাকেই কবি সমকালের ফ্রেমে নির্মাণ করেননি। বিনয়ের নন্দনতত্ত্বে রাজনীতি-অর্থনীতি, যাপিত জীবনের জায়গা হয়নি, যার স্বীকৃতি আমরা তার কবিতাতেই পাই :

> *প্রিয়তার কথা যদি ওঠে, তবে বলা যায়, বলে রাখা ভাল*
> *স্থান, কাল, পাত্র নয়—আমরা সকলে শুধু বিকশনপ্রিয়।*
> *[অঘ্রাণের অনুভূতিমালা]*

বিনয় মজুমদারের বিশ্ববীক্ষা বেশ ভালো পরিমাণে পাওয়া যায় পিয়াসের *নাচপ্রতিমার লাশ*-এও। বইটি জুড়ে কবি ভাষার নানা কারুকাজ করেছেন। কিছু কিছু স্থানে কবিতাগুলোকে পাঠকের লাগতে পারে অলংকার-ভারাতুর, যেন কবি অনেক গহনা দিয়ে সাজিয়ে একেকটি কবিতাকে হাজির করেছেন পাঠকের সামনে। গহনার ভিড়ে চেহারার প্রকৃত আদল কিছুটা আড়াল হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে। একদিকে যেমন সমাসনিষ্পন্ন নতুন শব্দের বিন্যাস, আবার স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন, সূর্য না লিখে 'তপন' লেখা হয়েছে একখানে।

নাচপ্রতিমার লাশ পড়ে কবিতাগুলো কোন সময়ে লেখা তা হয়তো পাঠক বুঝতে পারবেন না। তার মনে হতে পারে এর ভাষা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমসাময়িক। তথাপি কবিতায় ব্যবহৃত উপমা-উৎপ্রেক্ষা অধুনা কালের। অনেকটা হাল সময়ে রিলিজ পাওয়া রেট্রো ধাঁচের গানের মতো। যেমন :

> *তোমার নাচের ভেতর পতন জাজ্বল্য দেখে খোলা রাখি সুরহীন*
> *গানের দুয়ার।*
> *

তুমি নিজেই হতে থাক থোকা থোকা বিষের ডুমুর।
*
সমুদ্র;
তোমার নৃত্যবিভায় সমুদয় জলই লাল নীল অগ্নি
আমার সমস্ত নৌবিদ্যা সেখানে লুণ্ঠিত

যেন এরকম ভাষার সাথে বাংলা কবিতার পাঠককুলের পুনরায় যোগাযোগ ঘটল বহু বছর পরে।

যেহেতু অনুষঙ্গের দিক দিয়ে কবিতাগুলো স্থান-কাল-পাত্র-নির্দিষ্ট নয়, কবিতাগুলোর সম্ভাবনা থাকত ভিন-ভাষায় অনুবাদের। কিন্তু কবিতাগুলোয় ভাষারীতি হয়েছে নিতান্তই বাংলার আপন। অনুবাদে তা উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা কম।

লক্ষণীয় যে *নাচপ্রতিমার লাশ* বইয়ের কবিতাগুলো যে সময়ে লেখা, সে সময়ে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের প্রচলন হয়তো ছিলই না, থাকলেও খুব সীমিত পরিসরে। সে সময়কার কাব্যপ্রয়াসীদের এটা মেনে নিয়েই লিখতে হতো যে তাঁদের কবিতার সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পিঠ-চাপড়ানি মিলবে না। সম্ভবত সে কারণেই *নাচপ্রতিমার লাশ*-এর কবিতাগুলোও আজকের দিনের সোশ্যাল মিডিয়ায় বাহবা কুড়ানো কবিতাগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ধ্রুপদি—এমন সিদ্ধান্তে আসা যায়।

নাচপ্রতিমার লাশ-এর বড় তাৎপর্যময় দিক হলো—কবির স্বতন্ত্র কাব্যভাষা নিয়ে বাংলা কবিতায় আত্মপ্রকাশ। এ বইয়ের ভাষাভঙ্গিই কবি পিয়াসের কবিজীবনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। নিজের তরুণ বয়সে লেখা অপরিপক্ব কবিতার বিষয়ে পরবর্তীকালে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে তুলনা করেছিলেন বড় মানুষদের সভায় ঢুকে অর্বাচীন বালকের করা পাকামোর মতো। সব সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও বলা যায়, কবির প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে *নাচপ্রতিমার লাশ* অনেক সম্ভাবনার জন্ম দেয়।

মগ্নতার ঋতুতে জন্ম নেওয়া স্বপ্ন অথবা বাস্তব

সুন্দরের মুখোমুখি হওয়ার জন্যই আমাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকা—এমন বিশ্বাস কবিকে রাখতে হয়। বিজ্ঞানীকে যেমন বিশ্বাস রাখতে হয় গবেষণার উপাত্তে, প্রমাণে। বণিককে যেমন বিশ্বাস রাখতে হয় মুনাফায়। আজকের চল্লিশ ছুঁই ছুঁই কবি পিয়াস মজিদের কবিজীবনের প্রথমদিকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *মারবেল ফলের মওসুম* আমাদেরকে যেন এই কথাটাই মনে করিয়ে দেয়। এই লেখাটি লিখবার ঠিক এক যুগ আগে, অর্থাৎ ২০১২ সালে প্রকাশিত বইটি কবির দ্বিতীয় কবিতার বই।

বইটিতে ঢুকবার আগেই কবি এক স্ব-বিরোধিতার ধাঁধায় পাঠককে ফেলেন, যখন পাঠক দেখেন বইয়ের নাম *মারবেল ফলের মওসুম* (অর্থাৎ ঋতু), আবার বইয়ের প্রাক্‌কথন (prologue) অংশে ঘোষণা দেন—

মারবেল ফল ঋতুহীন
স্বপ্নে ফলে
স্বপ্নেই এর জন্ম, বিকাশ পরিণাম
তবে স্বপ্নপ্রসূ বলে তা অলীক নয়
কারণ স্বপ্নও তো এক ভীষণ বাস্তবতা

যে ফল ঋতুহীন, তারই ঋতু বইয়ের নামে দেখে পাঠককে একটু নড়েচড়ে বসতে হয়। তরুণ কবিকে সচেতন পঠনের তাগিদই বইয়ের

আরম্ভে রাখা এই ধাঁধাতে।

মারবেল ফলের মওসুম পড়তে গিয়ে বোঝা গেল যে কবিতার এই ভাষা, এই আঙ্গিক, নির্মাণশৈলী বাংলা সাহিত্যে নতুন। কবি পিয়াস মজিদ ভাষা এবং ভাবের এক সুপ্রতিসম (Symmetrical) সম্পাত করতে সক্ষম হয়েছেন এ বইয়ের কবিতাগুলোতে। কবিতাগুলোর অলংকারে রয়েছে কিছুমাত্রায় ধ্রুপদি কাব্যসাহিত্যের উপাদান, তবে ভাব ও ভাবনায় এ কালের এক কবিকেই পাঠক খুঁজে পান কবিতাগুলোতে। এক ব্যতিক্রমী নিরীক্ষার প্রয়াস মেলে বইটিতে। তবে বইয়ে নিরীক্ষা নয় বরং নন্দনই মূল উপজীব্য হয়ে থাকে।

বইটিতে কবিতার সংখ্যা তেতাল্লিশ। এদের কোনোটিই দীর্ঘ নয়। কবির মিতবাক কাব্য-কারিগরির দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে শীর্ণকায় হ্রস্ব কবিতাগুলো। অল্প শব্দের পরিসরে আকাঙ্ক্ষিত ভাবটি প্রকাশ করে কবিতাগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ঠিক যেমন, ফুলের স্বর শুনে গন্ধভাষায় স্বপ্ন জরিপ করে কবির প্রতীতি হয় যে 'যুক্তাক্ষরময় পৃথিবীতে/ তুমিই একমাত্র/ সোজাসাপ্টা ব্যথা' [কবি]।

মাত্র দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হলেও কবি বইটিতে তার স্বকীয় স্বর নিয়ে হাজির হন বাংলা কবিতার ঘরে। পাঠকের পরিচয় ঘটে এক নতুন কাব্যভাষার সাথে। নতুন নতুন সমাসনিষ্পন্ন শব্দ যেমন, নৃত্যনিষ্ঠুর, ক্রুশকুসুম, ক্রেতাগুণরিক্ত, অশ্রুকুমকুম, পাথরচেতনা, চুম্বনঝরোকা—এরকম আনকোরা শব্দবন্ধের কাননে হারিয়ে যেতে হয় পাঠককে।

দুই

পাঠক হিসেবে বইটি পড়তে গিয়ে মনে হয় যেন রকমারি ফুলগাছঘেরা এক বাগানের মধ্য দিয়ে ভোরবেলা হাঁটছি। সে বাগানের এক প্রান্তে বসা সংগীতসভায় পরিবেশিত হচ্ছে মোহিনী রাগরাগিণী। ফুল এবং সংগীতের

যুগলবন্দি পাঠককে দৃশ্যকল্পের এক জগতে বরণ করে নেয়। ফুল এবং সংগীতের অবতারণা আছে এমন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এরকম—

আমাকে বধির করে
বাগিচায় জন্ম নেয়
সহস্র শিমুল আর
পলাশভাষা।
[শিল্পকলা]

তৃষ্ণার মওসুমে
সুরভিত কাননে শুধু
গরম পানির ঝরনা
লাইটপোস্টে ঘনীভূত
অন্ধকারমালা।
[তোমার গিলোটিনে]

এই ফুল কুয়াশাক্রান্তি মাঠের প্রসূন।
বেদনার ডোলগুলো ভরে ওঠে
রাগ আনন্দীর বিচ্ছুরণে।
[ক্রুশকুসুম]

আমার কবর
আনন্দ ভৈরবী।
[রাগিণী]

বসন্তদাহে একাকার সব;
পোড়া পবন ও গোলাপ
[তুষারতোরণ]

অপর একটি কবিতায় কবির জবানে এসেছে যে, একটি ঝরনা কবিকে আহত করে, অপর একটি ঝরনা তার শুশ্রূষা। 'ঝরনাগুলো

পরস্পর সৎ-মায়ের সন্তান হলেও তারা গত জনমের যমজ' [তরঙ্গ]।

মারবেল ফলের মওসুম-এর কবিতাগুলো শ্রুতিমধুর হয়েছে কবিতায় শব্দের নান্দনিক ব্যবহার থেকে। কবি কবিতাগুলোকে বেঁধেছেন ফুলের সৌরভ আর রাগরাগিণীর তারানায়। প্রেম এবং বিরহের প্রকাশেও কবি যথাসাধ্য সাংগীতিক। যেমন একটি কবিতায় এসেছে—

সে চলে যায়।
এখন আমার ওপর জনম জনম এই
সিম্ফনির আগ্রাস।
[শোভা]

অথবা,

আর কে যেন সন্ধ্যার শান্ত গান ছেনে
শিল্পহারা পিয়াসের জন্য তুলে রাখে
রক্তিম রাগমালা।
[পারমিতা]

বাস্তব ও স্বপ্নে মার খাওয়া মানুষ কবি ঐ প্রভা ও সুরশক্তির পায়ে কেবল একবিন্দু অশ্রু ঢেলে দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন।

মারবেল ফলের মওসুম-এর কবিতার ভাষা কবির প্রথম প্রকাশিত বই *নাচপ্রতিমার লাশ*-এর কবিতাগুলোর মতো অলংকারবহুল নয়। বরং অল্প অলংকারেই কবি সাজিয়েছেন *মারবেল ফলের মওসুম*-এর কবিতাগুলোকে। বাংলা ভাষার ধ্রুপদি শব্দাবলিকে কবি ব্যবহার করেছেন বইয়ের কবিতায়। অবশ্য কেবল শব্দ নয়, কবিতা ধ্রুপদি হয়ে ওঠে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং প্রকাশিত ভাবের নতুনত্বের বিচারে।

এই বইয়ের কাব্যভাষা কবির নিজস্ব স্টাইল নির্মাণ করে তার পরবর্তী বইগুলোর দিক নির্ণয় করে দিয়েছে। যদিও কয়েক স্থানে প্রচলিত একেলে বাংলাকে সরিয়ে দিয়ে ধ্রুপদি বাংলা তার জায়গা জবরদখল করেছে বলে মনে হয়। যেমন :